দৈনিক ইত্তেফাক

79-A

তারিখ 30 JAN 1989
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

ঢাকা : সোমবার, ১৭ই মাঘ, ১৩৯৫

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও সম্ভাব্য পরিবর্তন

অধ্যাপক মোঃ শামসুল হক
সদস্য
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন

স্বাভাবিক অবস্থায় বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় পড়াশোনা করলে একজন বিদ্যার্থীর সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করতে ষোল বছর সময় লাগে। এর মধ্যে পাঁচ বছর প্রাথমিক, তিন বছর নিম্ন-মাধ্যমিক, দু'বছর মাধ্যমিক ও দু'বছর উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এতে মোট বার বছর সময় লাগে। আর বাকী চার বছর মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে হয়। প্রথম পাঁচ বছরের শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষা ও বাকী সাত বছরের শিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষা বলা হয়। আর পরবর্তী চার বছরের শিক্ষাকে বলা হয় উচ্চশিক্ষা।

প্রাথমিক শিক্ষা : প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় দু'টি ধারা বিদ্যমান। একটি হ'ল সাধারণ বিদ্যালয়। এতে বিদ্যার্থীর বয়সোপযোগী সব রকম শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে। আর অন্যটি হ'ল ইবতেদায়ী মাদ্রাসা। এতে ধর্মশিক্ষার উপর প্রাধান্য দেয়া হয়। তবে পরিমাণে কম হলেও এগুলোতে অন্যান্য সাধারণ শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। ১৯৮৭ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৯১,১৫,৫৫৪। আর ইবতেদায়ী মাদ্রাসার ছাত্রসংখ্যা ১৬,০০,০০০। এ দু'ধারা যোগ করলে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১,০৭,০০,০০০। বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধরলে ২০০০ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ১,৭৫,০০,০০০। বর্তমানে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী মিলিয়ে বিদ্যালয় আছে ৫৭,২২৪(৪৪,২২৪+১৩,০০০)টি। আর শিক্ষক আছেন ২,৪২,৫৫৭ (১,৯০,৫৫৭+৫২,০০০) জন। প্রতি ২৫০ জন ছাত্রের জন্য একটি করে বিদ্যালয় ধরলে মোট বিদ্যালয়ের প্রয়োজন হবে ৭০,০০০টির। বর্তমানে যা আছে সে সংখ্যা বাদ দিলে আরও ২২,৭৭৬টি বিদ্যালয়ের প্রয়োজন থেকে যাবে। আর ২০০০ সাল নাগাদ শিক্ষকের প্রয়োজন হবে ৩,৫০,০০০ জনের। তন্মধ্যে বর্তমানে যা আছে সে সংখ্যা বাদ দিলে আরও ১,০৭,৪৪৩ জন শিক্ষকের প্রয়োজন হবে।

নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক : নিম্নমাধ্যমিক স্কুলগুলোতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ান হয়। আর মাধ্যমিক স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা হয়। এখন নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক মিলিয়ে মোট স্কুলের সংখ্যা প্রায় ১০,০০০টি। আর উচ্চ মাধ্যমিক অর্থাৎ ১১শ' ও ১২শ' শ্রেণীর জন্য কিছু কিছু আলাদা বিদ্যালয় আছে। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এ শিক্ষা কলেজেই পরিচালিত হয়। দেশে বর্তমানে ২৯১টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও প্রায় ৪৫০টি ডিগ্রী কলেজ আছে। এই ৭৪১টি বিদ্যালয়েই উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা আছে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত —যেমন মানবিক, বাণিজ্যিক, বিজ্ঞান ইত্যাদি।

ভোকেশনাল, পলিটেকনিক, নার্সিং, প্যারামেডিক্যাল ও কৃষি বিদ্যালয় : ৮ম শ্রেণী পাসের পর ছাত্র-ছাত্রীদের কিয়দংশ বৃত্তিমূলক ও কারিগরি বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে। আবার দশম শ্রেণী পাসের পরে অনেকে পলিটেকনিক, নার্সিং, প্যারামেডিক্যাল ও কৃষি বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে। এরাই হল মাঠকর্মী। এদের শিক্ষার জন্য বর্তমানে ৫১টি ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট, ১০টি টেকনিকেল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট, ১৮টি পলিটেকনিক, ১টি নার্সিং স্কুল রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে গ্লাস-সিরামিকস, চর্ম ও বয়ন প্রযুক্তিতে শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা, লাইব্রেরী বিজ্ঞান প্রভৃতিতে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা।

ধর্মীয় শিক্ষা : মাদ্রাসা শিক্ষা : পূর্বেই প্রাথমিক স্তরে ইবতেদায়ী মাদ্রাসার কথা বলেছি। মুসলমান ছেলেমেয়েদের একাংশ প্রথম থেকে মাদ্রাসা শিক্ষার দিকে যায়। তারা ইবতেদায়ীতে ৫ বছর, দাখিল ৫ বছর, আলিম ২ বছর, ফাজিল ২ বছর ও কামিলে ২ বছর অধ্যয়ন করে মাস্টার্স ডিগ্রীর সমকক্ষ হতে পারে। তারা বেশীরভাগ সময় ব্যয় করে কোরান, হাদিস, তফসির, ফিকা, অসুল, আরবী ভাষা ইত্যাদি অধ্যয়নে। তবে আজকাল মাদ্রাসাগুলোতেও সাধারণ বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, বাংলা, ইংরেজী প্রভৃতিও পড়ান হয়। বর্তমানে দেশে দাখিল থেকে কামিল পর্যন্ত পড়ার জন্য ৪২২০টি মাদ্রাসা আছে। ইবতেদায়ী ছাড়া অন্যান্য স্তরের পরীক্ষাসমূহ পরিচালনা করে মাদ্রাসা বোর্ড। বর্তমানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্রমান্বয়ে এ ধারার উচ্চশিক্ষা পরিচালনার ভার গ্রহণ করতে শুরু করেছে।

(খ) টোল শিক্ষা :—সংস্কৃত ও পালি শিক্ষার জন্য দেশে প্রায় ২০০টি টোল রয়েছে। এতে হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় শিক্ষা লাভ করে। এখানে আদ্য, মধ্য ও উপাধি এ তিন স্তরের শিক্ষা রয়েছে। এ শিক্ষা পরিচালনা ও সমন্বয় সাধন করে "বাংলাদেশ সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ড।"

সনাতন চিকিৎসা ও হোমিও চিকিৎসা : পুরানো আমলের ইউনানী ও আয়ুর্বেদী চিকিৎসা প্রথা আজও জনপ্রিয়তা হারায়নি। দেশে একটি সরকারী ইউনানী কলেজ এবং পাঁচটি বেসরকারী ইউনানী ও আয়ুর্বেদী কলেজ আছে। মাধ্যমিক বা সমপর্যায়ের মাদ্রাসার শিক্ষা লাভের পর শিক্ষার্থিগণ ইউনানী কলেজে চার বছর অধ্যয়ন করে। অনুরূপভাবে মাধ্যমিক বা সমপর্যায়ের টোলে অধ্যয়নের পর ছাত্ররা আয়ুর্বেদী কলেজে চার বছর অধ্যয়ন করে সনদ লাভের পর আয়ুর্বেদী চিকিৎসা আরম্ভ করে। আয়ুর্বেদী চিকিৎসা এদেশেই উদ্ভূত হয়। আর ইউনানী মুসলমান রাজা-বাদশাদের আনুকূল্যে সমৃদ্ধি লাভ করে। তাই এর বইপত্র আরবী, পার্সি ও উর্দু ভাষায় লিখিত। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বোর্ড ইউনানী ও আয়ুর্বেদী চিকিৎসার ক্ষেত্রে দেখাশুনা, পরীক্ষা নেয়া, সার্টিফিকেট দেয়া ও অন্যান্য দায়দায়িত্ব পালন করে।

উচ্চ মাধ্যমিক পাসের পর হোমিওপ্যাথি কলেজে ভর্তি হওয়া যায়। পাঁচ বছর পর কৃতী ছাত্ররা এম-বি-বি-এস ডিগ্রী পেতে পারে। হোমিওপ্যাথি মেডিকেল বোর্ড এ ডিগ্রী দিয়ে থাকে।

উচ্চশিক্ষা : উচ্চ মাধ্যমিক পাসের পরে মেধাবী শিক্ষার্থীরা সাধারণ কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাস বা সম্মান স্নাতক কোর্সে ভর্তি হতে পারে। পাস কোর্সের মেয়াদ দু'বছর আর সম্মান কোর্সের মেয়াদ তিন বছর। এর পর পাস কোর্সে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীরা দু'বছর মেয়াদী মাষ্টার্স আর তিন বছর মেয়াদী সম্মান কোর্সে পাস করা শিক্ষার্থীরা এক বছর মেয়াদী মাষ্টার্স ডিগ্রী লাভের জন্য পড়াশুনা করতে পারে। বর্তমান পদ্ধতিতে প্রাথমিক থেকে মাষ্টার্স পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার ধরন হ'ল ৫+(৩+২+২(২/৩)+২/১

বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সাধারণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান অনুষদসমূহে পড়াশুনা করা ছাড়াও প্রকৌশল, চিকিৎসা ও কৃষি

(৭ম পৃঃ দ্রঃ)

দৈনিক ইত্তেফাক

30 JAN 1989
তারিখ
পৃষ্ঠা ... কলাম 3

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

(৬ষ্ঠ পৃঃ পর)

বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ রয়েছে। প্রকৌশলে ও কৃষিতে ৪ বছর মেয়াদী স্নাতক কোর্স চালু আছে। পরে এক বছর অধ্যয়ন করলে মাষ্টার্স ডিগ্রী লাভ করা যায়। আবার চিকিৎসা ও স্থাপত্য বিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রী লাভ করতে হলে পাচ বছর অধ্যয়ন করতে হয়। দেশে ১টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ৪টি ইনষ্টিটিউটে প্রকৌশল শিক্ষা পরিচালিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ বছর মেয়াদী স্নাতকের পর ১ বছর মেয়াদী মাস্টার্স ডিগ্রীতে পড়াশুনার ব্যবস্থা আছে। অনুরূপভাবে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ২টি কৃষি কলেজে ৪ বছর মেয়াদী স্নাতক কোর্স পরিচালিত হয়। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ বছর মেয়াদী মাস্টার্স কোর্সে লেখাপড়া করানোর ব্যবস্থা আছে। দেশে ৯টি মেডিকেল কলেজে ও ১টি ডেন্টাল কলেজে চিকিৎসা শাস্ত্রে পাঁচ বছর মেয়াদী স্নাতক কোর্সে লেখাপড়া করান হয়। অতএব দেখা যায়, কৃষি, প্রকৌশল ও চিকিৎসায় মাস্টার্স বা সমপর্যায়ের ডিগ্রী নিতে হলে উচ্চ মাধ্যমিকের পর পাঁচ বছর অধ্যয়ন করতে হয়। অর্থাৎ মোট সময় লাগে (১২+৫) = ১৭ বছর।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এম-ফিল ও পিএইচ-ডি কোর্স চালু আছে। চিকিৎসা শাস্ত্রে উন্নততর ডিগ্রীর জন্য পোস্ট গ্রাজুয়েট চিকিৎসা ইনস্টিটিউটে শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা আছে।

সম্ভাব্য পরিবর্তন : উপরে যা বলা হ'ল তাতে দেখা যায় বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় প্রায় সব উপকরণই রয়েছে। তবুও মনে হয় কোথায় যেন গলদ রয়ে গেছে। কারণ বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসেও দেখতে পাই আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার ২0% বড় বেশি উপরে উঠেনি। এদের মধ্যে কিন্তু অর্ধেকের বেশিই কেবল টিপসই ছাড়া আর কিছু জানে না। তাই প্রকৃত অর্থে লেখাপড়া জানা লোকের হার ১0% বেশী হবে না। আবার তা সত্বেও এদের মধ্যে অনেকেই বেকার। তাই মনে হয় শিক্ষার বর্তমান কাঠামোর প্রতি আমাদের নজর দিতে হবে, নজর দিতে হবে বিষয়বস্তুর উপর, নজর দিতে হবে দেশের ও সমাজের প্রয়োজনের দিকে।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও সম্ভাব্য পরিবর্তন

আসলে শিক্ষার লক্ষ্য হল বিদ্যার্থীর পূর্ণ ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলা। এর জন্য চাই নৈতিক, মানসিক, ভৌত, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিদ্যার মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন। প্রাথমিক স্তর থেকেই এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কোন্ শিশুর কখন কোন্ দিকে বুদ্ধিবৃত্তি ফুটে উঠবে তা কিছুদিন না গেলে বোঝা সহজ নয়। তাছাড়া জীবনধারণের প্রয়োজনেও সকলেরই সাধারণভাবে সব বিষয়ে মোটামুটি প্রাথমিক জ্ঞান বাঞ্ছনীয়। শিশুই হউক আর বয়স্কই হউক শিক্ষাটা যেন কার্যকর শিক্ষা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মোট কথা এখন যে পরীক্ষা-ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে তার পরিবর্তে জীবন-ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন একান্ত প্রয়োজন। মুখস্তের চেয়ে উপলব্ধির উপর জোর দিতে হবে বেশি। প্রয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। মোট কথা শিক্ষা পদ্ধতিতে পেটের খোরাক ও মনের খোরাক দুই জোগাবার মত জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। শিশু-শিক্ষার্থীকে এমন করে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে যাতে সে একদিকে তার পরিবার, সমাজ ও দেশ সম্বন্ধে সচেতন হয়, অন্যদিকে প্রকৃতি রাজ্যের নিয়ম সম্বন্ধে ভাবতে শেখে।

প্রাথমিক স্তর থেকে সব বিষয়ে সাধারণভাবে জানার ওপর জোর দিতে হবে দু'কারণে। একটি হ'ল, সববিষয়ে কিছুটা উপলব্ধি থাকলে যার যেদিকে ঝোঁক সেদিকে স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহল জেগে উঠবে এবং পরে সে উক্ত বিষয় বা বিষয়সমূহে, বিশেষ জ্ঞান লাভের ক্ষেত্র হিসেব বেছে নিতে পারবে। আর দ্বিতীয় কারণ হ'ল, প্রাথমিক শিক্ষার পর যারা আর পড়তে পারবে না, উপলব্ধি থাকলে তারা দক্ষ শ্রমিক হতে পারবে এবং কাজের মানুষ হবে। তা করতে হলে যা প্রয়োজন তাহ'ল, শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকেই পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীর সংস্কার সাধন করা এবং তা প্রয়োগের জন্য শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আর অনুকূল মনমানসিকতার সৃষ্টি করা।

কৃষি, শিল্প বা চিকিৎসা সবই বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল। তাই আমরা মোটামুটি সকলেই বিজ্ঞান শিক্ষার কথা বলি। কিন্তু তা সত্বেও বিজ্ঞান এখনও আমাদের কাছে পোশাকী ব্যাপার হয়ে রয়েছে। উন্নত দেশগুলোর মত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আমাদের সংস্কৃতির অংগ হতে পারেনি। আর তার ফলে আমরা এখনও আর্থিক উন্নতির মুখ দেখতে পারছি না। তাই প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি দিয়ে আরম্ভ করে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ বিজ্ঞান সকলের জন্য অবশ্য পাঠ্য হিসাবে পরিগণিত করা দরকার, পাঠ্য বইগুলো এমন হবে যাতে ছেলে-মেয়েরা বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করতে পারে।

দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলে কাজে লাগাতে পারলেই দেশে বেকার সমস্যার সমাধানও হবে আবার শিল্পে ও কৃষিতে বিপ্লব সাধিত হবে। এরজন্য একদিকে জাতীয় পরিকল্পনার সাথে শিক্ষা পরিকল্পনার যেমন সমন্বয় করতে হবে, অন্যদিকে বর্তমানের শিক্ষা কাঠামোকে ঢেলে সাজাতে হবে। ২000 সাল নাগাদ প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হলে আরও ২২,৭৭৬টি বিদ্যালয় ও ১,0৭,৪৪৩ জন শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। বর্তমানে যে সকল বিদ্যালয় আছে তাতে দু'শিফটে কাজ চালানো যেতে পারে এবং পর্যায়ক্রমে আরও স্কুল প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা নিতে হবে। শিক্ষকের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ভাতা দিয়ে বর্তমানে যে শিক্ষকরা আছেন তাদের দিয়ে কাজ চালানো এবং কিছু স্বল্প-মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো। তবে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই সতর্ক থাকতে হবে। কারণ কেবল পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী বদলালেই কাজ হবে না। যাঁরা তা পড়াবেন তাঁদের উপলব্ধি ও মন-মানসিকতা যদি সেভাবে গড়ে না ওঠে তবে সবই হবে পণ্ডশ্রম। তাই পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী নির্ধারণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের কাজ একসাথেই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর অন্তত ৫0% শিক্ষার্থীই লেখাপড়ায় আর অগ্রসর হয় না। অধি-

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 30 JAN 1989
পৃষ্ঠা 7 কলাম 3

79-C

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

কাংশই কর্মক্ষেত্রে যোগ দেয়। এরা যাতে দক্ষ শ্রমিক হতে পারে তার জন্য এ অবস্থাতে ৩-৬ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। এর জন্য আলাদা কেন্দ্র স্থাপন করা অথবা প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে এর ব্যবস্থা রাখা যায়। এরা হবে দক্ষ শ্রমিক। এদের কর্মকৌশল উৎপাদনে সহায়ক হবে। পর্যায়ক্রমে ১ম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এ আট বছরের শিক্ষাকেই প্রাথমিক শিক্ষা হিসাবে বিবেচনা করা দরকার। আবার ইবতেদায়ী মাদ্রাসা বলে শিক্ষার প্রথম স্তর থেকেই কতিপয় শিশুদের আলাদা একটা ধারায় শিক্ষা দেয়া বাতিল করে সকলকে একই ধারায় শিক্ষিত করে তোলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত দীনিয়াত বাধ্যতামূলক থাকতে পারে। তাহ'লে শিশুরা পরস্পরকে ভালভাবে বুঝতে পারবে। ছোটবেলা হতে দু'টা আলাদা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়বে না। এর পর যে যেদিকে যেতে চায় সেদিকে যেতে দিতে হবে।

অষ্টম শ্রেণীর পর যাদের ইচ্ছা ও মেধা আছে তারা মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ভর্তি হবে। অন্যরা কেউ বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কেউ মাদ্রাসা শিক্ষা আবার কেউ শারীরিক শিক্ষা বা অপর কোন কাজে লেগে যাবে। অনুরূপভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর যারা মেধার পরিচয় দিবে তারা উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি হবে। আর যারা রইল তারা প্যারামেডিক্যাল, নার্সিং, পলিটেকনিক, কৃষি প্রকৌশল বা অন্য কোন বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এদের থেকেই তৈরী হবে নিম্ন ও মাধ্যমিক শ্রেণীর প্রযুক্তিবিদ। এরা হবে মাঠকর্মী। এদের দক্ষতাই দেশে এনে দিবে শিল্প ও কৃষি বিপ্লব। এদের মধ্য থেকেই বের হবে মাস্টার টেকনিশিয়ান। প্রথমত, একজন প্রকৌশলী থেকে একজন মাস্টার টেকনিশিয়ানের মান-মর্যাদা কোনক্রমেই কম হওয়া উচিত হবে না। দ্বিতীয়ত, ভোকেশনাল ও পলিটেকনিক্যাল পর্যায়ে যারা দক্ষতা দেখাতে পারে তারা যদি উচ্চতর শিক্ষা নিতে চায় তা হলে কোন বাধা থাকা উচিত হবে না।

মাধ্যমিক স্তর থেকে পাস করা কৃতী ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ভর্তি হয়। বর্তমানে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীর জন্য খুব কমসংখ্যক বিদ্যালয় আছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এরা ডিগ্রী কলেজে পড়াশুনা করে। প্রধানত উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পরেই ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা সাধারণ কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ডিগ্রী কোর্সে ভর্তি হতে পারে। তাছাড়া চিকিৎসা, প্রকৌশল, কৃষি, বয়ন টেকনোলজী, লেদার টেকনোলজি প্রভৃতি কলেজ ও টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার এদের জন্য খোলা। আর মানবিক শাখার ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান, আইন প্রভৃতি শাখায় ভর্তি হন। আবার বাণিজ্যিক শাখার শিক্ষার্থীরা বাণিজ্য, মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান ও আইন শাখায় ভর্তি হতে পারে। উচ্চ-মাধ্যমিকের পর যারা লেখাপড়া করতে পারে না তারা জীবিকার অন্বেষণে কোন না কোন কাজে যোগ দেয়। এসব বিবেচনা করে উচ্চমাধ্যমিক একটা প্রান্তিক শিক্ষা হিসাবে ধরে নেয়া যেতে পারে। আর এ শিক্ষার জন্য আলাদা ব্যবস্থা না করে মাধ্যমিক স্কুলসমূহের সাথে একে যোগ করে দেয়া যায়।

উচ্চমাধ্যমিকের পর যোগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী স্তরে যে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে তা নানা রকমের। কেউ তিন বছর মেয়াদী ডিগ্রী কোর্সে ভর্তি হয়। আবার তা না পেলে অনেকেই দু'বছর মেয়াদী ডিগ্রী কোর্সে ভর্তি হয়। অনার্সের ক্ষেত্রে কলেজগুলোতে সনাতনী অনার্স (অর্থাৎ তিন বছর পর একটি পরীক্ষা) প্রথা চালু রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কোথাও বাৎসরিক পরীক্ষা আবার কোথাও সেমিষ্টার পদ্ধতি (অর্থাৎ বছরে দু'বার পরীক্ষা) ইত্যাদি চালু আছে। দু'বছর মেয়াদী ডিগ্রী আজকাল বিশ্বের আর কোথাও তেমন চালু নেই। এর দামও তেমন কেউ দেয় না। অন্যদিকে সবক্ষেত্রেই বিষয়বস্তুও অনেক বেড়ে গেছে এবং দ্রুত পরিবর্তিতও হচ্ছে। তাই পাস ও অনার্সের আলাদা ধারা না রেখে তিন বছর মেয়াদী একটি মাত্র স্নাতক কোর্স চালু করা যেতে পারে। এধারায় যারা কোন বিষয়ে নির্দিষ্ট মানের উপরে নম্বর বা গ্রেড পাবে তাতে তাদেরকে অনার্স দেয়া আর যারা আবার একটা নির্দিষ্টমানের চেয়ে বেশি নম্বর বা গ্রেড পাবে তাদেরকে কেবল মাষ্টার্স ডিগ্রী পড়ার সুযোগ দেয়া। মনে রাখতে হবে যারা শিক্ষকতা ও গবেষণা করবে তাদেরই মাষ্টার্স ও উচ্চতর ডিগ্রীর প্রয়োজন এ স্তরে এসে শিক্ষার কিছুটা সঙ্কোচন দোষের হবে না।

স্নাতক ডিগ্রীর পর পরই বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবে। তাই লক্ষ্য রাখতে হবে পড়াশুনা যে যাই করুন কেন, পাসের পর প্রত্যেকে যেন একটা কিছু করে খেতে পারে এবং নিজেরাই উদ্যোক্তা হয়ে উৎপাদনমুখী কাজে লেগে যায়। তাই স্নাতকের শেষ বর্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কিছু প্রয়োগমুখী যুগোপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা দরকার। বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের জন্য ইলেক্ট্রনিক্স, কম্পিউটার, এনিমেল নিউট্রিশান, এনভায়রনমেন্ট বায়লজি প্রভৃতি ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে থাকতে পারে। আবার মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান শাখার ছাত্রদের জন্য নাটক, সিনেমা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য সমাজসেবামূলক কাজে উৎসাহ যোগাবার মত ঐচ্ছিক বিষয় থাকতে পারে।

এছাড়া নানা জায়গায় আইন কলেজ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, খেলাধুলা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রভৃতির ব্যবস্থা রাখতে হবে। সবশেষে আরও একটি নতুন অথচ খুবই প্রয়োজনীয় শিক্ষায়তনের কথা এখানে উল্লেখ করেছি সেটা হল উন্মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে সাধারণ কোর্স ছাড়াও কাজের ফাঁকে ফাঁকে যারা চায় তারা যেন শিক্ষা নিতে পারে তার ব্যবস্থা থাকবে। মোট কথা শিক্ষাব্যবস্থা যাহাই হউক না কেন, লক্ষ্য রাখতে হবে শিক্ষার্থী যেন এমন শিক্ষা পায় যাতে জ্ঞান, দক্ষতা ও উপলব্ধির সংযোগ ঘটে।